গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

আরাফতকে নির্বাসনের ইজরায়েলি চক্রান্তের নিন্দায় এস ইউ সি আই

প্যালেস্টাইনি নেতা ইয়াসের আরাফতকে তাঁর স্বদেশভূমি থেকে নির্বাসিত করার যে সিদ্ধান্ত মার্কিন মদতপুষ্ট উগ্র ইহুদীবাদী ইজরায়েলি সরকার ঘোষণা করেছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১৩ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে এই বিপজ্জনক প্রচেষ্টার প্রতিবাদে দেশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইজরায়েলি সরকারের প্রকৃত মতলব হল প্যালেস্টাইনি জনগণের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রামকে ধ্বংস করা। এই ফ্যাসিবাদী মতলবকে রুখে দেওয়ার জন্য এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণকেও আহবান জানান।

শ্যারনের ভারত সফরের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

শ্যারনের ভারত সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ (উপরে) কলকাতায় বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। (নিচে) রাজধানী দিল্লীতে বিক্ষোভ মিছিল।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার হাত মিলিয়েই নতুন বিদ্যুৎ আইন তৈরি করেছে

১০ সেপ্টেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে "বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার" এই বিষয়ের উপর অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মুম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীর দাশগুপ্ত, বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুজয় বসু, পরিবেশবিদ চির দত্ত, অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস। প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী বলেন, যে নূতন আইন হয়েছে সে আইন হয়েছে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করেই। এই আইনের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক নয়। রাজ্য সরকারের মনোনীত কমিশনের হাতে প্রায় সব ক্ষমতা রয়েছে। প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীর দাশগুপ্ত বলেন, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ বোর্ড ভেঙে দেবার যে কথা বলা হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে আমার তার প্রতি সমর্থন নেই। এর ফলে ভাল কিছু হবে বলে মনে হয় না। বিদ্যুতের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিৎ হবে, সরকারি কোম্পানি তৈরি করে তার হাতে পর্ষদকে তুলে দিয়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সুজয় বসু বলেন, এই আইন চরমভাবে জনস্বার্থবিরোধী। বিশ্বায়নের আর্থিক নীতিকে কার্যকরী করতে এই আইন করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি হবে। যেসব রাজ্যে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে সেখানে বিশেষ কোন লাভ হয়নি। ওড়িশা মডেল ব্যর্থ। এনরন ব্যর্থ। সরকার তা থেকে শিক্ষা না নিয়ে সেই পথেই এগিয়ে চলছে।

পরিবেশবিদ চির দত্ত বলেন, বর্তমান আইনের অনেকটাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগেই কার্যকরী

আটের পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের রায়কে স্বাগত জানাল এস ইউ সি আই

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে জানান ঃ

"কলকাতা হাইকোর্ট ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর পরপর দুটি মামলায় রায় দিয়েছে যে বিদ্যুৎ পর্ষদের ৫২ পয়সা মাশুল বৃদ্ধি ও রাজ্য সরকার কর্তৃক ৯ পয়সা ফুয়েল সারচার্জ বৃদ্ধি বিধি বহির্ভূত।

এই রায়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে রাজ্য সরকার ও বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষগুলি শুধু গ্রাহকস্বার্থ বিরোধীই নয়, অগণতান্ত্রিক ও বে-আইনী কাজ করে চলেছে।

এই ঐতিহাসিক রায়ে গণআন্দোলনের দাবিরই প্রতিফলন ঘটেছে এবং আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি।

আমরা অবিলম্বে এই দুটি রায় কার্যকরী করার ও এতদিন যে বাড়তি মাশুল বেআইনীভাবে আদায় হয়েছে সেটা গ্রাহকদের ফেরৎ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

আবার ভাড়াবৃদ্ধি

প্রতিবাদ জানাল নাগরিক কনভেনশন

ডিজেলের সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হতেই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার আবার পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি করা হবে বলে ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার সুবর্ণ সমাজ বণিক হলে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশন পরিচালনা করেন জননেত্রী প্রতিভা মুখার্জী। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্যামল গুহ মজুমদার। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা, এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা দেবপ্রসাদ সরকার, অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, সাংবাদিক রাঘব বন্দোপাধ্যায় ও অধ্যাপক কান্তীশ মাইতি। সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় — তেলের দামবৃদ্ধিকে অজুহাত করে রাজ্যের সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার নতুন করে বাসের ভাড়া বাড়াতে চলেছে। ফলে, রাজ্যের আপামর সাধারণ মানুষের ওপর চাপতে চলেছে আবার এক দফা মূল্যবৃদ্ধির বোঝা। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির যুক্তি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে তেল কোম্পানীগুলি অন্যায়ভাবেই তেলের দাম বাড়াচ্ছে। এর ফলে পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধি করতেই হবে বলে রাজ্য সরকার যেভাবে যুক্তি করছে তা ঠিক নয়। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে লিটার পিছু ১ টাকা ৩১ পয়সা। গত কয়েকমাসে ধাপে ধাপে তেলের দাম কমেছে ৩.০৪ টাকা। সকলেরই স্মরণে আছে, তখন সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ এবং এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বারে বারে ভাড়া কমানোর দাবি তোলা হয়। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার পুলিশ দিয়ে সেই আন্দোলনের উপর আক্রমণ চালায়। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন এবং প্রবল জনমতের চাপে সরকার ভাড়া কমাতে বাধ্য হয়। যদিও তা নামমাত্র। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এবার দামবৃদ্ধির পর ডিজেলের দাম হয়েছে ২২.৫৩ টাকা, যা এবছর এপ্রিল মাসে ভাড়া বাড়ানোর সময় ডিজেলের যে দাম ছিল (২৩.৫১ টাকা), তার থেকে কম। তাই এই কনভেনশনের সুস্পষ্ট অভিমত হল, তেলের এই সামান্য মূল্যবৃদ্ধির ফলে মালিকদের ক্ষতির কোন প্রশ্নই ওঠে না, হয়ত মুনাফার সামান্য কিছু হেরফের হতে পারে মাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, এমনকি পরিবহন মালিকদের একাংশ ভাড়া বাড়াতে না চাইলেও রাজ্য সরকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা রাজপথে

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষাস্বার্থবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের যাবতীয় সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন করে কলকাতার এসপ্ল্যানেড এলাকায় সারাদিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েকশত শিক্ষক-শিক্ষিকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে আন্দোলনে উপস্থিত থেকে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন।

অবস্থান সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন — এই সরকার শিক্ষাকে ধ্বংস করছে, শিক্ষক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এদের আমলে শিক্ষার মান বলে কিছু নেই। সিলেবাস প্রণয়নে শিক্ষকদের কোন মতামত নেওয়া হয়না। সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে। সর্বশিক্ষার অভিযানের নামে চলছে ছলচাতুরি। তিনি বলেন — শিক্ষকদের বেতন, পেনসন সবই আজ অনিশ্চিত। শিক্ষকরা অসহায়। হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য, পূরণ করা হচ্ছে না। শিক্ষকদের জন্য টিচার্স হেল্‌থ হোম গঠনের কথা বলে টাকা সংগ্রহ করা হলেও তা লোপাট করা হয়েছে। এই সরকারের শিক্ষক দিবস পালন ভড়ং ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তিনি এর বিরুদ্ধে সকলকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান।

অবস্থান বিক্ষোভে সভাপতিত্ব করেন কুশধবজ মণ্ডল। বক্তব্য রাখেন অজিত হোড়, আব্দুস সালাম, কার্তিক হাজরা, অনুকূল বর, তপতী মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

প্রায় ১৫ দিন আগে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান সত্ত্বেও শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের স্মারকলিপি নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোন মন্ত্রী হাজির না থাকায় শিক্ষকসমাজ চরম বিক্ষুব্ধ হন। একসময় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শিক্ষকরা মিছিল করে মহাকরণের দিকে যাবার হুমকি দিলে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে তাদের আটকানোর চেষ্টা হয়। পরে মহাকরণে যোগাযোগ করে স্মারকলিপি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহার নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন।

সমিতির পক্ষ থেকে ১৭ দফা দাবিপত্র পেশ করে বলা হয়েছে, অবিলম্বে দাবি না মিটলে অদূর ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

বিদ্যুতের দাবিতে দার্জিলিং মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ

চম্পাসারীর বিফাই বস্তিতে ৪৬নং ওয়ার্ডে বিদ্যুতের খুঁটির দাবিতে ইতিপূর্বে প্রধাননগর বিদ্যুৎ অফিস, পাওয়ার হাউসের ডি-ই, এস-ডি-ও এবং শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়রকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তারা বিদ্যুৎ খুঁটি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রায় ৪/৫ মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে ৬ সেপ্টেম্বর ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। দার্জিলিং মোড়ে এই অবরোধে সামিল হয় চম্পাসারীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং দার্জিলিং মোড়ের দোকানদার সহ কয়েকশত মানুষ। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় অবরোধ চলার পর উপস্থিত শিলিগুড়ি থানার ও-সি উক্ত দাবিগুলি নিয়ে এস-ডি-ও এবং মেয়রের সাথে দ্রুত আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধে নেতৃত্ব দেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল, মমতা দেবী, সুজিত নিয়োগী প্রমুখ। আন্দোলনের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থনের চাপে পড়ে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট দ্রুত বিফাই বস্তিতে বিদ্যুতের লাইন পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছেন।

ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাল নাগরিক কনভেনশন

একের পাতার পর

আগ বাড়িয়ে ভাড়া বাড়াতে চলেছে।

রাজ্য সরকার রোড ট্যাক্স, মোটর ভেহিকলস্ ফি, পারমিট ফি, লাইসেন্স ফি বাড়িয়েছে অস্বাভাবিক হারে। এই অন্যায় কর বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে আমরা এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে এই বর্ধিত কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সরকার বেপরোয়া গাড়ি চালানো, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনা বন্ধ করে যাত্রীজীবনের নিরাপত্তার কার্যকরী কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অথচ পুলিশি জরিমানাকে অস্বাভাবিক হারে বাড়িয়ে চলেছে। এবং এই জরিমানাকে মালিকরা তাদের খরচ হিসাবে দেখাচ্ছে। এই নানান কর ও ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাস মালিকদের সংঘবদ্ধ ধর্মঘটের চাপের কাছে সরকার নতি স্বীকার করলেও উক্ত ট্যাক্সগুলি না কমিয়ে পুনরায় ভাড়াবৃদ্ধি করে মালিকদের সন্তুষ্ট করতে চাইছে। অর্থাৎ সরকার মূল্যবৃদ্ধির বোঝা থেকে বাস মালিকদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করছে এবং এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধির ভারে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ওপর তা চাপিয়ে দিচ্ছে। এই ঘটনা বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী এবং মালিকতোষণকারী চরিত্রকেই আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের চাপানো বিপুল করের ওপর বামফ্রন্ট সরকারও নজিরবিহীনভাবে ডিজেল-পেট্রোলের ওপর লিটার পিছু ১ টাকা করে সেস এবং ৭৫ পয়সা হারে বিক্রয় কর বসিয়েছে — যা এ রাজ্যে ডিজেল-পেট্রোলের দাম আরও বাড়াতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি এও আমরা লক্ষ্য করছি যে, বারবার ভাড়া বাড়ালেও পরিবহন কর্মী, বিশেষ করে

বেসরকারী পরিবহন কর্মীদের স্থায়ী বেতন, চাকরির নিরাপত্তা ও সামান্যতম কোনও সুযোগ সুবিধা নেই বা দেওয়া হচ্ছে না।

প্রস্তাবে গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলা হয়, কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার উভয়েই শিল্পমহলকে নানান অজুহাতে শতশত কোটি টাকা ছাড় দিচ্ছে, ভরতুকি দিচ্ছে। অথচ পরিবহনের মতো একটি পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার নানান ধরনের ট্যাক্স বসিয়ে চলেছে এবং প্রায় পুরো পরিবহন ব্যবস্থাকে বেসরকারি মালিকদের হাতে সঁপে দিয়ে তাকে বিপুল মুনাফা তৈরির ক্ষেত্রে পরিণত করছে। ইতিপূর্বে ভাড়া বাড়ানোর সময়ে বর্ধিত ভাড়ার ৯ শতাংশ যাত্রী পরিষেবার উন্নতির জন্য ব্যবহারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরিবহন মন্ত্রী, তা সম্পূর্ণ প্রতারণা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে যাত্রী পরিষেবা খাতে ন্যূনতম ব্যয় না করেও আবার ভাড়া বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তকে এই কনভেনশন জনসাধারণের সাথে এক নিষ্ঠুর প্রতারণা বলেই মনে করে।

কনভেনশনে দাবি করা হয়েছে—

১। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে নতুন করে ভাড়া বাড়িয়ে মালিকদের অতিরিক্ত লাভের ব্যবস্থা করা চলবে না।

২। ইতিপূর্বে বর্ধিত ভাড়ার সঙ্গে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির নামে আদায় করা অতিরিক্ত ৯ শতাংশ ভাড়া থেকে আদায় হওয়া কয়েক কোটি টাকা নিয়ে 'যাত্রী কল্যাণ তহবিল' গঠন করতে হবে।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে তেল কোম্পানীগুলির যথেচ্ছ দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৪। রোড ট্যাক্স, পারমিট ফি, লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বাড়ানো চলবে না।

৫। তেলের ওপর রাজ্য সরকারের চাপানো সেস ও কর প্রত্যাহার করতে হবে।

৬। ভাড়া নির্ধারণের জন্য যাত্রী প্রতিনিধি সহ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে।

৭। বাস শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা, পি এফ এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করতে হবে।

নিহতদের স্মারকবেদী ভেঙে দিল সি পি এম

গত ৭ সেপ্টেম্বর দুর্গাপুর ভিরিঙ্গী মোড়ে পুলিশ যেখানে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে ৩ জন নিরীহ গরিব মানুষকে হত্যা করেছিল, সেখানে শত শহস্র শোকার্ত মানুষের উপস্থিতিতে মানুষের হৃদয়াবেগ, শোকানুভূতি, চোখের জলে যে স্মারকবেদী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, রাতের অন্ধকারে সি পি এম সেই বেদী ভেঙে দিয়ে দুর্গাপুরের মানুষের হৃদয়াবেগকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করেছে। গণধিক্কারের মুখে পড়ে আজ সেই ঘৃণ্য কাজকে অস্বীকার করতে গিয়ে, হীন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে তারা একথা বলছে যে, ওখানে কোন বেদী নির্মাণ করাই হয়নি। কতখানি নিচে নামতে পারলে দলের নেতৃত্ব গোয়েবলসীয় কায়দায় বেদীর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে পারে, সি পি এমের সৎ কর্মীরা তা ভেবে দেখবেন। ক্ষমতায় থেকে পুঁজিবাদের সেবা করতে গিয়ে শঠতা, প্রবঞ্চনা, ছলনা, প্রতারণা, প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তির চর্চায় তারা নিজেদের মানবিক মূল্যবোধকে শেষ করে ফেলেছে। যে কারণে, পথ দুর্ঘটনায় নিহত গরিব ফুচকাওয়ালার মৃত্যুতে, ক্ষতিপূরণের ন্যায্য দাবিতে সাধারণ মানুষের পথ অবরোধের ন্যায্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে 'সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব' আখ্যা দিতে, এবং পুলিশের নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৩ জন গরিব দিনমজুরকে হত্যা করার বর্বরোচিত কাজকে শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে উচিত কাজ বলে সমর্থন জানাতে এবং এর প্রতিবাদে ডাকা ৫ সেপ্টেম্বর ন্যায়সঙ্গত বন্ধ আন্দোলনের বিরোধিতা করতে তাদের বিবেকে বাধে নি। নিজেদের বিবেক মনুষ্যত্বকে হত্যা করে তারা এতখানি নিচে নেমেছে যে, স্মারকবেদী ভেঙে দিয়ে সেখানে একটি দলীয় ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে এসেছে। শাসকদের গুলিতে শ্রমজীবী জনগণের রক্তে লাঞ্ছিত যে রক্তিম পতাকা মানুষের মুক্তির মহান সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে একদিন মেহনতী মানুষ হাতে তুলে নিয়েছিল, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, অসাম্যের বিরুদ্ধে উন্নত মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি, উচ্চ আদর্শের মহান আবেদন যে লাল পতাকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত, সি পি এম নেতৃত্ব তাকেই অসম্মান করেছে। মানুষের কাছে মার্কসবাদের উন্নত আদর্শকে হেয় করে তোলার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে তারা মাথা তুলতে সাহায্য করছে। ক্ষমতায় থেকে সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চর্চায় ওরা মানুষকেও নিচে নামাচ্ছে। মানুষের মধ্যে লোভ, লালসা, নীচতা, সুবিধাবাদ, হীন ব্যক্তিস্বার্থ, রুচিহীনতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় জুগিয়ে যাচ্ছে। এই পথেই ফ্যাসিবাদ আসে। ওরা তারই পথ প্রশস্ত করছে। তাই মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার স্বার্থেই আজ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, হীন মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। সি পি এমের বিবেকবান কর্মীদের কাছে আবেদন, সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করতে আপনারাও নেতৃত্বের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসুন। এই সংগ্রাম একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, যার প্রয়োজনে সাধারণ মানুষকে আজ সক্রিয় হতে হবে, নিজেদের সংঘবদ্ধ হতে হবে, গণআন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরূপে এগিয়ে আসতে হবে।

সর্বশিক্ষা অভিযান
শিক্ষা সংহারের এক নয়া কৌশল

ঢাকঢোল পিটিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযানের প্রচার চলছে। এ নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকার ভীষণ রকমে সরব। এ রাজ্যে সর্বশিক্ষা অভিযানের নামে যেন মহোৎসব চলছে। জুলাই মাস থেকে শুরু হয়েছে একের পর এক মিটিং। ১৫ আগস্ট রাজ্যে প্রায় সর্বত্র শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিছিল করা হয়েছে। যদিও ৩/৪ ঘণ্টার প্রোগ্রামে প্রায় কোন জায়গাতেই ছাত্রছাত্রীদের এক টুকরো খাবারও জোটেনি। শুকনো মুখে বেশির ভাগ জায়গায় শোকমিছিলের মত করে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে তারা সর্বশিক্ষার মিছিল করিয়েছে। সরকারি প্রচার হল — এবার নাকি সকলের জন্য শিক্ষার বিষয়টা কেউ আটকাতে পারবেনা। মিটিং-মিছিল করেই সর্বশিক্ষা অভিযান সাঙ্গ করে ফেলা হবে।

এখন একটু তলিয়ে দেখা যাক, সর্বশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার ঠিক কী কী বলতে চাইছে ও করতে চাইছে। সরকার প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি অনুধাবন করে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি এবার দেখা যাক।

কেন সর্বশিক্ষা অভিযান ?

এ সম্পর্কে শুরুতেই বলা হয়েছে — ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের সময়ে (১৯৫০ সালে) সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল — ১০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী তারপর থেকে নানা কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে, রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কালে ঘোষিত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতেও ঐ একই অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে। ঐ অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে — যেমন, অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা ইত্যাদি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, দশ বছরের মধ্যে তো দূরের কথা, স্বাধীনতার ৫৬ বছর বাদেও অদ্যাবধি ৫-১৪ বছর বয়সী ২০ কোটি শিশুর মধ্যে ৪.২ কোটি শিশুকে, অর্থাৎ প্রায় ২১% ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা যায়নি। সারা দেশে অন্তত ১ লক্ষ জনবসতি আছে, যেখানে ১ কিমির মধ্যে কোন বিদ্যালয় নেই। পশ্চিমবাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে কয়েক হাজার গ্রামে এখনও কোন বিদ্যালয় নেই, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে আজও স্কুলের গণ্ডির বাইরে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৬ বছর বাদেও কেন এই চিত্র তার কোন সরকারি ব্যাখ্যা আজ অবধি পাওয়া যায়নি। তাহলে প্রশ্ন হল, সরকারি তরফে শুধু তথ্য তুলে ধরলেই হবে? ব্যর্থতার কারণগুলি চিহ্নিত না করলে তা দূরীভূত করার রাস্তা বের করা সম্ভব কি?

সর্বশিক্ষা অভিযান কী ?

সর্বশিক্ষা অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারি বক্তব্যে বলা হয়েছে, ৫-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত গুণমানের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক একটি প্রকল্প। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প পরিচালিত হবে। এর লক্ষ্য ও সময়সীমা হিসাবে বলা হয়েছে —

ক) ২০০৩ সালের মধ্যে ৫-১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ;

খ) ২০০৬ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা (১ম-৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত) সুনিশ্চিত করা ;

গ) ২০১০ সালের মধ্যে প্রতিটি শিশুর ৮ বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষা (১ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) সুনিশ্চিত করা ;

ঘ) ২০১০ সালের মধ্যে ৫-১০ বছর বয়সী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সুনিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলি রূপায়ণের জন্য পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ

ক) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সভাপতি, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীকে কার্যকরী সভাপতি করে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক উন্নয়ন সংস্থা' গঠন করা হয়েছে ;

খ) মুখ্যসচিবকে সভাপতি করে রাজ্য পর্যায়ে একটি টাস্ক ফোর্স তৈরি হয়েছে ;

গ) বিকাশ ভবনে স্থাপন করা হয়েছে রাজ্য প্রকল্প দপ্তর।

অনুরূপভাবে জেলাস্তরে দেখভালের জন্য —

ক) জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে সভাপতি ও জেলা সমাহর্তাকে কার্যকরী সভাপতি করে জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হলেন সহ-সভাপতি।

জেলাস্তরের নিচে আছে পঞ্চায়েত সমিতি (বিশেষত এর শিক্ষা স্থায়ী সমিতি)। তার পরের স্তরে রয়েছে সার্কেল পরিদর্শকের দপ্তর। এর নাম হয়েছে চক্র সম্পদ কেন্দ্র। তার নিচে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র, গ্রাম সংসদ স্তরে গ্রাম শিক্ষা কমিটি ইত্যাদি।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি দেখলে মনে হবে — এত সময়বাঁধা প্রোগ্রাম এবং এতভাবে কমিটি গঠন করে কাজে নামা হয়েছে — এবার বোধহয় কিছু একটা হবে। কিন্তু প্রশ্ন, ইতিপূর্বে কী কখনও এরকম সময়বাঁধা কার্যক্রম ছিলনা বা কমিটি গঠিত হয়নি? এগুলির অভাবেই কী পূর্বের প্রচেষ্টাগুলি মার খেয়েছে? আদৌ তা নয়। শুধু নামের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু পরিবর্তন থাকলেও মূলগত কোন বিশেষ পার্থক্য পূর্বে ও বর্তমানে নেই। এমনকি সংবিধান তৈরির সময় ১০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ৬০ সালের মধ্যে এগুলি রূপায়ণ করার সাংবিধানিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা হয়নি কেন? এটাই অনুধাবন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। তাই বেশি আলোচনা না করে চোখবুজেই বলে দেওয়া যেতে পারে — এ ব্যাপারে কর্মসূচিও একইভাবে মার খাবে। তবুও তাদের প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন দিকগুলি আরও খতিয়ে দেখা যাক।

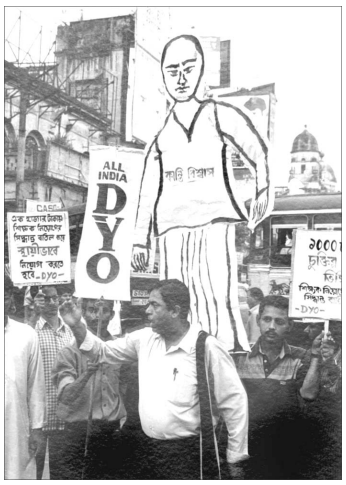

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্পে নামমাত্র বেতনে বেকার যুবক-যুবতীদের চুক্তিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে তার বিরুদ্ধে এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর চৌরঙ্গীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এ প্রসঙ্গে এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির ইনচার্জ কমরেড এন কর্মকার বলেন, চুক্তিতে নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত অসহায় বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি অবিলম্বে সমস্ত শূন্য পদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান।

কী করা হচ্ছে ?

২০০৩ সালের মধ্যে ৫-১৪ বছর বয়সী সব শিশুকে স্কুলের গণ্ডিতে নিয়ে আসার জন্য, অর্থাৎ ভর্তি করানোর জন্য শিক্ষকদের উপর যে কাজগুলি চাপান হয়েছে, তা হল — বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিহ্নিত করতে হবে কারা স্কুলে আসছে না। তাদের ভর্তি করার জন্য সবুজ কার্ড দিতে হবে। খুব ভাল কথা। আগস্ট মাস পর্যন্ত এর জন্য সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল। যদি এর মধ্যে না হয় তাহলে সেপ্টেম্বর মাসকেও ব্যবহার করা যাবে। যে কাজ ৫০/৫৫ বছরে হয়নি — সে কাজের জন্য এবার সময়সীমা ৫০/৫৫ দিনও নয়। যেন সব রেডি হয়ে বসে আছে, মাস্টার গিয়ে ডাকলেই ছেলেরা স্কুলে চলে আসবে। সমস্যার গভীরতা বোঝার এই কি নমুনা?

শিক্ষকদের উপর এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, শিক্ষকদের সঙ্গে নাকি সাক্ষরতার লোকজনও থাকবেন। শিক্ষকরা কখন যাবেন? স্কুলের সময়কালের মধ্যে? তাহলে স্কুলের পড়া মার খাবে। স্কুলের সময়কালের আগে বা পরে গেলে — তাঁরা ঐ কাজ করে এসে আবার মন দিয়ে পড়াতে পারবেন? হয়ত দেখা যাবে, এর ফলে স্কুলের শিক্ষাদান কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু চেষ্টায় ৫ জন ছাত্র নতুন এল তো পুরনো আরও ১০ জন চলে যাচ্ছে। এভাবে কাজ করলে কতটা কাজ হবে — তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মূল সমস্যা কী ?

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার মূল সমস্যা কী? ইচ্ছে করে কেউ স্কুলে আসছে না? জোর করে ধরে আনলেই হবে? বিষয়টা কি এরকম? আদৌ তা নয়। এর মূল কারণ ভয়াবহ দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে স্কুলে আসছে না। কোটি কোটি ছেলেমেয়ে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। তারা শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তব সত্যকে কি তাঁরা উপলব্ধি করছেন? নাকি চোখ বন্ধ করে শুধু প্রচারে বাজিমাৎ করার চেষ্টা করছেন?

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন তখন তিনিও এই নির্মম সত্যকে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন। তার জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করার মতো।

গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি দেখলেন — একটি ছোট ছেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কী বলছে এবং আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। দেখে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কৌতূহল হল। কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা করলেন। শুনতে পেলেন — ছেলেটি মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, কী আনন্দ, আজ বাড়িতে ডাল রান্না হয়েছে, ডাল দিয়ে ভাত খাব। এই কথা বলে মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় উপলব্ধি করেন, দেশের ঘরে ঘরে কী অপরিসীম দারিদ্র্য, বাড়িতে ভাতের সঙ্গে ডাল হওয়া যেন একটা উৎসবের ব্যাপার। এই ভয়াবহ দারিদ্র্য দূর করতে না পারলে এদের কোনদিন শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনা সম্ভব হবে না। মহাকরণের ঠাণ্ডা ঘরে বসে অনেক বিবৃতি দেওয়া যায়, কিন্তু গ্রামেগঞ্জে ঘুরলে এই বাস্তব সত্য সকলের সামনেই ফুটে উঠবে। শুধু শ্লোগানে ও বক্তৃতায় ছেলেদের স্কুলে আনা যাবে না, আনলেও ধরে রাখা যাবে না।

আজ থেকে ২৫ বছর আগে বিধানসভার এষ্টিমেট কমিটি কী সুপারিশ করেছিল? প্রয়াত নির্মল বসু তখন ঐ কমিটির চেয়ারম্যান। ঐ কমিটির পক্ষে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলার পর একই মত তাদের বক্তব্যেও ফুটে উঠেছিল — চরম দারিদ্র্যই সর্বজনীন শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়।

এসব অভিমতগুলিকে গ্রহণ করে যদি মূল সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ না নেওয়া যায় — তাহলে সস্তা প্রচার সাময়িক পাওয়া যাবে, বাস্তবে কিছু হবেনা।

সংবাদে প্রকাশ — মধ্যপ্রদেশের কোন একটি রেল স্টেশনে কিছু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে জুতো পালিশ করে। এরা স্কুলে যাবে কী করে? তাহলে খাবে কী? তাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কোন একটি এন জি ও স্টেশন প্লাটফর্মেই স্কুল খুলল। ট্রেন এলে স্কুল ছুটি, তখন তারা জুতো পালিশ করে। আবার ট্রেন চলে গেলে, প্লাটফর্ম ফাঁকা হলে আবার স্কুল বসে। এই বাস্তবকে অস্বীকার করে শুধু 'স্কুল চলো' আওয়াজ দিলেই এরা স্কুলে চলে আসবে? হয়ত ভয় দেখালে একদিন, বা লোভ দেখালে দু'দিন আসবে — তারপর আবার ছিটকে যাবে। এভাবে বুঝে বুঝে প্রয়োজনমত জায়গায় সরকারি উদ্যোগে স্কুল তৈরি করতে হবে। এন জি ও-র ওপর শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে হবে না। তাছাড়া শুধু গরিব ছেলের পেটের অন্নের জোগান দিলেই হবে না — তার উপর যারা নির্ভরশীল তাদের জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তো এরা স্কুলে আসার আকর্ষণ বোধ করবে। শিক্ষার মানে বুঝতে পারবে। অন্যথায় ফাঁকা আওয়াজে কাজের কাজ কিছু হবেনা।

বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে?

ক) নূতন স্কুল কই?

কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? যথার্থই সরকার আন্তরিকভাবে সর্বশিক্ষা অভিযানে লিপ্ত হচ্ছে? সততার সঙ্গে তারা কাজকর্ম করছে? এ রাজ্যের বি পি এল লিস্টের কথা আপাতত ছেড়ে দিলেও (ঐ লিস্ট নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আছে) সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী প্রায় ২১ শতাংশ ছেলেমেয়ে এখনও স্কুলের আওতার

চারের পাতায় দেখুন

বন্যা পরিস্থিতি

যুদ্ধকালীন গুরুত্বে আগাম ব্যবস্থা নিতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল বন্যার ভয়াল গ্রাসে পড়েছে। ত্রাণ প্রায় নেই। সরকার নিষ্ক্রিয়, সংবাদপত্র প্রায় নীরব। জল ঢুকছে বিহার হয়ে। বিহারের রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ঐ রাজ্যে মোট ২৫টা জেলা বন্যা কবলিত হয়েছে। এ পর্যন্ত বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১৪২। সব কটি নদীর জলই বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। গঙ্গার বিপুল জলরাশি যা বিহারে যথেষ্ট তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, তার একটা অংশ ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছেছে, যা মালদায় তুমুল ভাঙনের ধবংসলীলার পাশাপাশি বন্যার সূচনা করেছে। ইতিমধ্যেই জেলার ৫টি ব্লকের ৮০,০০০ মানুষ বন্যাকবলিত। ভাগলপুর থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত গঙ্গা ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ দফতর সংবাদ দিয়েছে। গঙ্গার এই জলরাশি মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক করে তুলবে বলে কেন্দ্রীয় জল কমিশন জানিয়েছে। (সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১২ সেপ্টেম্বর, ০৩)

মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় গঙ্গার জল বিপদসীমার অনেক ওপর দিয়ে বইছে। এই বাড়তি জল ফারাক্কা, সুতী-১, রঘুনাথগঞ্জ-২, লালগোলার কোনো কোনো এলাকা, ভগবানগোলার বেশ কিছু এলাকা ও নির্মল চরে বন্যার সূচনা করেছে। ভগবানগোলা, জলঙ্গী, ধুলিয়ানে ভাঙ্গনও রয়েছে অব্যাহত। ভৈরবের জলও ইসলামপুর সহ বেশ কিছু এলাকায় চাষের জমি ডোবাতে শুরু করেছে। প্রতিদিনই ব্যাপক বৃষ্টির কারণে এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনার গান্ধীঘাটে ৩-৪ ফুট করে জল বেড়েই চলেছে। ৯৮-র বন্যায় গঙ্গার জলস্তর যা ছিল, আশঙ্কা করা হচ্ছে, এবার মালদায় গঙ্গা সেই সীমা ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং সেই জল যখন এই রাজ্যে ঢুকবে, তার পরিণতিতে গঙ্গা-পদ্মা ও ভৈরব সহ শাখানদীগুলি তীরবর্তী জেলাগুলিতে ব্যাপক বন্যা সৃষ্টি করবে। নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণাও বিপদের হাত থেকে পার পাবে না। যদিও এসব জেলায় বর্তমানে বৃষ্টিপাত গড় হিসাবে তুলনায় বেশ খানিকটা কম — যেমন ছিল ২০০০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। সুতরাং বকেয়া বৃষ্টি যদি এই সময়ের মধ্যে বাংলায় নেমে আসে, তবে সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। তাই বন্যার আশঙ্কা এখন আর নিছক অনুমান বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এই ঋতুতে বর্তমানে ডি ভি সি প্রভৃতির উচ্চ অববাহিকায় পার্বত্য মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে।

এই পরিস্থিতিতে, ১৯৭৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বন্যা বিপর্যয়ের যে সামগ্রিক জ্ঞান, তার ভিত্তিতে বলা যায়, ইতিমধ্যেই ভাঙন ও বন্যার কবলে পড়া হাজার হাজার মানুষের ত্রাণের ব্যবস্থা এখনি করতে হবে, সাথে সাথে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে অবিলম্বে গ্রহণ করা দরকার। প্রতিটি বন্যায় উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যে রাজ্য সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার নিরিখে এই পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি সর্বস্তরের জনগণের। ত্রিপল, খাদ্য ও ওষুধ, ডাক্তার, শিশুখাদ্য, পানীয় জলের জোগানের আগাম ব্যবস্থার সঙ্গে জলবন্দিদের উদ্ধারের জন্য যথেষ্ট নৌকা ও অন্যান্য পরিবহন তৈরি রাখাটা জরুরি দরকার — যার অভাব বিগত বন্যায় প্রকট হয়ে উঠেছিল। জলাধারগুলির ও অন্যান্য উৎসের বন্যার জলপ্রবাহের আগাম সময়োচিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যে চূড়ান্ত দৈন্য ও অনুপস্থিতি গত বন্যায় লক্ষ্য করা গিয়েছিল — সে ব্যাপারে প্রণালীবদ্ধ নজরদারী ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া আশু দরকার, যাতে ফ্ল্যাশ ফ্লাডের (জলের হানা) হাত থেকে মানুষ নিস্তার পায়। বন্যার দিনগুলির সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসাদার যেমন কৃত্রিমভাবে বাজারে প্রয়োজনীয় জিনিষের সঙ্কট তৈরি করে, ওই সব জিনিষের দাম আকাশছোঁয়া করে দেয়, সে ব্যাপারে প্রশাসনের আগাম পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি প্রয়োজন, যাতে ২০০০ সালের দিনগুলি আবার ফিরে না আসে।

এছাড়া বন্যার তাণ্ডবের সুযোগে জেলায় জেলায় যেমন দুষ্কৃতিদের বেপরোয়া লুঠতরাজ অতীতের বন্যায় হয়েছিল, কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও এখনই গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই শুধু নয়, জনগণের সমস্ত সংগঠনকেই জড়িত করার উদ্যোগ সরকার ও প্রশাসনকে গ্রহণ করতে হবে।

নদীভাঙনে নিরাশ্রয়দের পুনর্বাসনের দাবি

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ঠুর অবহেলায় দিনের পর দিন মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। বহু পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারী হচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এটা অনিবার্য ছিল না। কিন্তু এই দুঃসময়ে সরকার বলে যে কিছু আছে বোঝা যায় না।

দুই সরকারের কাছে আমরা দাবি করছি ঃ

(১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অবিলম্বে নদীভাঙন রোধ করতে হবে।

(২) নিরাশ্রয় পরিবারগুলিকে পূর্ণ আর্থিক পুনর্বাসন দিতে হবে।

শিক্ষা সংহারের এক নয়া কৌশল

তিনের পাতার পর

বাইরে। যুক্তির খাতিরে যদি ধরে নিই — এরা সকলেই সরকারি শ্লোগানে আপ্লুত হয়ে সোজা স্কুলে ভর্তি হতে চলে এল। তাহলে এরা বসবে কোথায়? রাজ্যে প্রায় ৫১ হাজার স্কুল। এর মধ্যে ১৯০০ স্কুল ইতিমধ্যেই উঠে গেছে। বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাকি ৪৯ হাজার স্কুলের মধ্যে আরও ২১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ঢুকতে পারবে? ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট (আই এস আই) এবং এস সি ই আর টি'র যুগ্ম সমীক্ষায় প্রকাশ — এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রায় ১০ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় দরকার। সরকার একটি স্কুলও তৈরি করেনি। করার কোন পরিকল্পনাও নেই। অথচ তারা সর্বশিক্ষার আওয়াজ তুলছে। যদি ছেলেমেয়েরা আসেও তবে তারা ঢুকবে কোথায়? বসবে কোথায়?

খ) শিক্ষক কোথায়?

এখনই রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য। বহু স্কুলে মাত্র ১ জন শিক্ষক (প্রায় ৮ হাজার স্কুলে), ২ জন শিক্ষকযুক্ত স্কুলের সংখ্যা প্রায় ২৫/৩০ হাজার, এত শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও পূরণ করা হচ্ছে না। বহু স্কুল শিক্ষকের অভাবে উঠে গেছে এবং উঠে যাওয়ার মুখে। এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, যেভাবে এক/দু'হাজার টাকায় অল্পসময়ের চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেছেন, তা শিক্ষকতার পেশার প্রতি, বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতি অপমান তো বটেই, সাথে সাথে সর্বশিক্ষার বিষয়টি যে আদতে একটি প্রহসন, তারও প্রমাণ। বাস্তবে এর দ্বারা প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধবসিয়ে দেওয়া হবে।

গ) বই কোথায়?

রাজ্যে এখনও ৫০%-এর বেশি ছেলেমেয়ে সরকারি বই পায়নি। প্রতি বছরের চিত্র প্রায় একই রকম — ৩০/৩৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে বই পায়না। এই অবস্থার মধ্যে সর্বশিক্ষা অভিযানের কল্যাণে যদি আরও কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয় — তারা বই পাবে কোথা থেকে? নাকি, বিনা বই-এ তারা লেখাপড়া করবে? এভাবেই শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে?

ঘ) মিড-ডে মিল কোথায়?

ভয়াবহ দারিদ্র্যের কারণে যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে আসেনা, বা মাঝপথে স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে — তা প্রতিরোধ করার কোন কার্যক্রমও সরকারের নেই। উপরন্তু মিড-ডে মিলের কর্মসূচিও এ রাজ্যে রূপায়িত হয়নি। মাত্র ১২০০ স্কুলে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়। (তাও অতি নিম্নমানের, বহু ক্ষেত্রে পশুখাদ্যেরও অনুপযোগী) সেসব খেয়ে অসুস্থ হওয়ার খবর মাঝে মাঝেই কাগজে দেখা যায়। এছাড়া বাকি স্কুলগুলিতে মাসে মাথা পিছু তিন কেজি চাল বরাদ্দ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বছরে ১০ মাস চাল দেওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ১ বার, ২ বার চাল দেওয়া হয়। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার ইত্যাদি দারিদ্র্যপীড়িত জেলাগুলিতেও ঐ একই চিত্র। যার ফলে দেখা যায় — যেদিন চাল দেওয়া হয়, সেদিন ছাত্রের ভিড় উপচে পড়ে, বাকী দিনগুলি স্কুল ফাঁকা। যদি ধরে নিই সর্বশিক্ষা অভিযানের শ্লোগানে আরও কয়েক লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলের আঙিনায় এল — তারা কোথা থেকে চাল পাবে? তাদের আদৌ চাল দেওয়া হবে কি? যে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে পড়ছে তারাই পাচ্ছেনা। নূতনরা পাবে কোত্থেকে?

এই সমস্ত বিষয়ের পরিকাঠামো না গড়ে তুলে শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজে সর্বশিক্ষা হবে? প্রস্তাবে অনেক ভাল কথা বলা হয়েছে। যেমন — (ক) প্রতিটি শিশুর বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, (খ) বিদ্যালয়ে পানীয় জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, (গ) মাঝে মাঝে শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধূলার আয়োজন করা, ইত্যাদি।

৬০% স্কুলে মাথায় চালা বলে কিছু নেই। অসংখ্য স্কুল চলে গাছতলায়। সেখানে প্রত্যেকের বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা কোন্ যাদুবলে হবে? পানীয় জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা — এতো কল্পনার স্বর্গ! বর্তমান স্কুলগুলির প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে এগুলির কোন ব্যবস্থা নেই।

এছাড়া শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলার আয়োজন করা — এসব তো ভাবনার বাইরে। সরকার এর জন্য কোনদিন কোন অর্থ বরাদ্দ করেছে? কোন স্কুলে খেলাধূলার কোন সামগ্রী বিগত ৫/৭ বছরের মধ্যে দেওয়া হয়েছে? সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য কোনদিন কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল? না, কোন ভাবনা চিন্তা ছিল?

আজ সর্বশিক্ষার দৌলতে ভাল ভাল কিছু কথা লিখে প্রচার করলেই সেগুলি হয়ে যাবে?

এখন কিছু কিছু টাকা স্কুলে দেওয়া হচ্ছে

এখন স্কুলে কিছু টাকা আসছে, সেই টাকা খরচ করতে হবে। কেন্দ্রের দেওয়া টাকা, সর্বশিক্ষার নামে। খরচ করার পরিকল্পনা হিসাবে বলা হয়েছে, শিক্ষক পিছু বার্ষিক অনুদান ৫০০ টাকা, বিদ্যালয়ে বার্ষিক অনুদান ২০০০ টাকা। এছাড়া ছোটখাটো মেরামতি কাজের জন্য বার্ষিক ৫০০০ টাকা অনুদান। এভাবে টাকা দেওয়ার অর্থ কী? শিক্ষক পিছু টাকা দেওয়া, নাকি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুপাতে টাকা দেওয়া, কোনটা প্রয়োজন? যে স্কুল ভেঙ্গে পড়ছে, যেখানে বসার কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই, যেখানে শিক্ষোপকরণ বলে কিছু নেই, খেলাধূলার সরঞ্জাম নেই, আরও প্রয়োজনীয় বহু জিনিষ নেই — সেখানে ১ জন শিক্ষক বলে তিনি পাবেন ৫০০ টাকা মাত্র। কী হবে এতে?

স্কুল বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা কিছু আছে? ইতিপূর্বে ডি-পি-ই-পি প্রকল্পে জেলাপিছু ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছিল? কীভাবে খরচ হয়েছে? ৭৪% টাকা ব্যয় করা হয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে। তাঁদের মগজ ধোলাই-এর জন্য? ক'টা স্কুলবাড়ি তৈরি হয়েছে? কত উপকরণ কেনা হয়েছে? নাকি হাজার হাজার টাকা লুটেপুটে খাওয়া হয়েছে? একটা জেলায় ৪০ কোটি টাকা খরচের প্রতিফলন কোথায়? তার তো কিছু নমুনা থাকবে? নাকি সব টাকা হাওয়ায় ভেসে গেল? ডি পি ই পি'র টাকার যে হাল হয়েছে, সর্বশিক্ষা-র ক্ষেত্রে সেই একই জিনিষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজের কাজ কিছুহবে না, শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়েই কাজ সারা হবে। আর টাকা সব খরচ হয়ে যাবে, হিসাবও দাখিল হয়ে যাবে। এ জিনিস আর কতকাল চলবে?

আর একটা সর্বনাশ হচ্ছে, তাহল, যত এরা এ'সব জিনিস করছেন — তত শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিনিয়ত মিটিং হচ্ছে, ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, এতেই শিক্ষকরা লিপ্ত থাকছেন। এরপর তাদের স্কুলের আরও নানা কাজ আছে। মূল্যায়নের খাতা তৈরি করা, চাল বিতরণের রেকর্ড ঠিক রাখা, মাসিক রিটার্ন তৈরি করা, ইত্যাদি। এগুলি করতেই সময় কাবার। তাঁরা পড়াবেন কখন? একে তো বেশিরভাগ স্কুলে এক/দুইজন শিক্ষক, তার উপরে এত কাজ। ফলে আসল কাজ পড়ানোই বাদ বা নমঃ নমঃ করে সারা। শিক্ষার সর্বনাশ হওয়ার আর বাকি কী থাকছে? তাই এই জিনিস শিক্ষার উন্নয়নের, শিক্ষার প্রসারের সহায়ক নয়, বাস্তবে শিক্ষা সংহারের আর এক ধাপ। নির্বিবাদে মানুষ কী এগুলি মেনে নেবেন — নাকি এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বেন? মনে রাখতে হবে, এদেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার নানা চক্রান্ত বার বার হয়েছে — কখনও ভাল কথার আড়ালে, কখনও জোর করে। কিন্তু এ রাজ্যের মানুষ কোনদিনই নির্বিবাদে তা মেনে নেয়নি।

সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার, শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার — এই দাবিতে ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠা চাই। আজও এরা কৌশল করে মানুষের ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিতে উদ্যত। আসুন সর্বশক্তি দিয়ে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, পর্যুদস্ত করি সরকারি ভাঁওতাবাজিকে। গড়ে তুলি নূতন ভবিষ্যৎ।

ফিলিস্তিন-ইসরাইল রোডম্যাপ

আরেকটি প্রতারণার দলিল

(নিবন্ধটি বা)লাদেশ থেকে প্রকাশিত 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার জুলাই স)খ্যা থেকে ঈষৎ সম্পাদিত আকারে প্রকাশ করা হল)

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কণ্ডোলিৎসা রাইসের মত হোয়াইট হাউসের বড় কর্তারা একজনের পর একজন মধ্যপ্রাচ্যে ছুটে যাচ্ছেন। এমনকি জর্জ বুশও কদিন আগে সেখান থেকে ঘুরে এসেছেন। ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ আববাস (সম্প্রতি ইনি পদত্যাগ করেছেন) এবং ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারনকে এক টেবিলে নিয়ে তিনি বৈঠক করেছেন। অথচ এই বুশ ক্ষমতায় আসার পর ২৬ মাস পর্যন্ত কোন ফিলিস্তিনি নেতার সাথে দেখা করা তো দূরের কথা, কথা বলতেও রাজি হননি। যদিও এ সময়ে শ্যারনের সাথে হোয়াইট হাউসে তিনি ৮ বার বৈঠক করেছেন, অন্য কোন বিদেশি নেতার বেলায় যা দেখা যায় নি।

বুশ প্রশাসনের মতলব হল গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে তাদের করতলগত করা। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যকে তথাকথিত "অবাধ বাণিজ্য এলাকা"-য় পরিণত করার প্রক্রিয়া তারা শুরু করেছে। এটা করতে হলে ওই এলাকায় মার্কিন স্বার্থবিরোধী সমস্ত শক্তিকে নির্মূল করতে হবে। এর অংশ হিসাবে তারা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিনীদের প্রধান শত্রু ইরাকের সাদ্দাম সরকারকে গায়ের জোরে উৎখাত করেছে। এখন তাদের প্রয়োজন হল ফিলিস্তিনিদেরকে বশে আনা। সে-লক্ষ্যে তারা এক 'রোডম্যাপ' বা তথাকথিত শান্তি পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

কিন্তু সমস্যা হল এই রোডম্যাপ-এর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন গ্রুপ তৎপরতা চালাচ্ছে। ইরাকের পরিস্থিতিও মার্কিনীদের জন্য ক্রমশ প্রতিকূল হয়ে উঠছে। সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারির বিরুদ্ধে ইরাকিদের গেরিলা যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। দিন দিন তা ব্যাপক রূপ নিচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে টিকে থাকাটাই মার্কিনীদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। সে কারণেই বুশ প্রশাসন কোন রকমে ফিলিস্তিনিদের একটা বুঝ দিয়ে সেখানে তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে।

ফিলিস্তিনি জনগণ গত প্রায় ৫৫ বছর ধরে ইসরাইলি দখল থেকে তাদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করছেন। তারা এক সাথে তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এ তিনটি শক্তি হল ইসরাইল, আমেরিকা এবং মার্কিন বশংবদ আরব রাষ্ট্রগুলোর শাসকশ্রেণী। কিন্তু এ তিন শক্তি মিলেও ফিলিস্তিনিদেরকে দমাতে পারছে না। বরং তাদের মুক্তিসংগ্রাম এখন আরব দুনিয়া এবং তার বাইরেও গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের কাছে একটা আইকনে (প্রতীকে) পরিণত হয়েছে। ফলে এটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে মধ্যপ্রাচ্যে কোন মার্কিন পরিকল্পনাই ঠাঁই পাবে না, এটা বুঝেই বুশ প্রশাসন রোডম্যাপ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে।

কী আছে রোডম্যাপ-এ ?

মার্কিন সরকারি পরিভাষায় রোডম্যাপ-এর নাম হল ''A Performance-Based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israel-Palestinian conflict''। এটাকে ভেঙে বললে, রোডম্যাপ-এর উদ্দেশ্য হল দুটি স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। রোডম্যাপ এগুবে সন্তোষজনক কার্যক্রমকে ভিত্তি করে। কার 'সন্তোষজনক' কার্যক্রম? এটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও বিশ্লেষকদের মতে তা অবশ্যই ফিলিস্তিনিদের তৎপরতাকে ইঙ্গিত করছে।

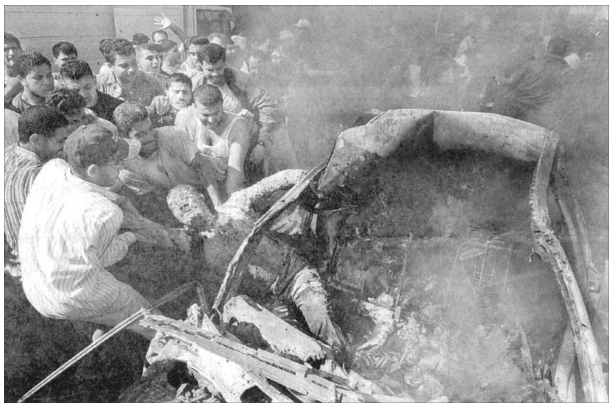

গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি হেলিকপ্টার থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র হানায় নিহত এক ফিলিস্তানিকে গাড়ি থেকে টেনে বার করা হচ্ছে

বলা হচ্ছে দলিলটি বাস্তবায়িত হবে তিনটি ধাপে। এ তিনটি ধাপ শেষে ২০০৫ সাল নাগাদ একটা চূড়ান্ত প্রস্তাব নেওয়া হবে। রোডম্যাপটি তত্ত্বাবধানের সাথে ইউরোপিয় ইউনিয়ন, রাশিয়া এবং জাতিসংঘ যুক্ত আছে বলা হলেও এখানে যে শুধু মার্কিনীদেরই আধিপত্য থাকবে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। রোডম্যাপ-এর প্রথম ধাপে "নিরাপত্তা"-র ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। পুরো বক্তব্যটি পড়লে বুঝা যায়, এদের এই 'নিরাপত্তা'র মানে হল ফিলিস্তিনিদের 'সহিংসতা এবং সন্ত্রাসের' অবসান।

রোডম্যাপটির অনেকগুলো সেকশন জুড়ে ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (PNA)-এর নিরাপত্তা বাহিনীর পুনর্গঠন, ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ সংগঠনগুলোকে তহবিল যোগান বন্ধ, PNA পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং তাদের কাজ তদারকি করার জন্য একটি মার্কিন-মিশর-জর্দান "তদারকি বোর্ড" গঠন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, জর্দান এবং মিশর উভয়েই মার্কিন অর্থে বিশাল পুলিশ বাহিনী পুষছে, যার প্রধান কাজ হল দেশ দুটোর জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা।

রোডম্যাপ-এ ফিলিস্তিনিদের সম্পর্কে এসব বিধান জারি হলেও ইসরাইল সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি। ইসরাইলি সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোথাও 'সহিংসতা', 'সন্ত্রাস' এসব শব্দ উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, সে যেন 'বিশ্বাসের ক্ষতি করে এমন কোন কাণ্ড না ঘটায়।'

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক উদ্যোগের পরিচালক আন্দ্রে এণ্ডারসন রোডম্যাপ সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক ভাষ্যে বলেছেন, "চুক্তির শর্তটি কেবলমাত্র ফিলিস্তিনি সহিংসতা বন্ধের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" আর ইসরাইল সম্পর্কে বলা হয়েছে, ''as the peace process advances, Israel should terminate new settlement programmes'' — অর্থাৎ শান্তি প্রক্রিয়া এগোতে থাকলে ইসরায়েল নতুন বসতি স্থাপনের কর্মসূচি বন্ধ করবে। এর অর্থ হল, শান্তি প্রক্রিয়া যতক্ষণ না বুশ-এর পছন্দমত জায়গায় পৌঁছাচ্ছে — যেটা আদৌ হয়তো কোনদিন পৌঁছবেনা — ততদিন ইসরায়েল বসতি স্থাপন করে যেতে পারবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে অসলো শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর পর ওই বসতি স্থাপন দ্বিগুণ হয়ে যায়, এগুলোতে বসবাসকারীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু রোডম্যাপ-এর প্রক্রিয়ায় ইসরাইল এ পর্যন্ত শুধু ফিলিস্তিনি বসতির কাছাকাছি কয়েকটি ঘর ভেঙেছে, যেগুলোর অধিকাংশ বহু আগেই পরিত্যক্ত ছিল। ফলে ইসরাইলি অবৈধ বসতি স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান কার্যত একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

রোডম্যাপ-এর ২য় ধাপ — এ বছরই শেষের দিকে শুরু হওয়ার কথা। মার্কিনীদের ধারণা অনুযায়ী ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ শক্তি নির্মূল হওয়ার পরই তা শুরু করা হবে। রোডম্যাপ-এ বর্ণিত ভাষায়, "দ্বিতীয় ধাপে, অস্থায়ী সীমানা এবং প্রতীকী সার্বভৌমত্বসহ একটা স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রগঠনের বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হবে।" অসম্ভব পিঠচাপড়ানো ভাষা এবং ঔপনিবেশিক স্বরে এতে বলা হয়েছে, "এ লক্ষ্য কেবল তখনই অর্জিত হবে যখন ফিলিস্তিনি জনগণ এমন এক নেতৃত্ব পাবে যারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে খুব জোরালোভাবে তৎপর হবে। সহনশীলতা এবং স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা গণতন্ত্র চর্চা করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম হবে।" তার মানে হল ফিলিস্তিনিরা যখন 'দেখাতে সক্ষম হবে যে তারা যোগ্য' তখনই তাদেরকে স্বায়ত্তশাসন (আত্মনিয়ন্ত্রণ নয়) দেওয়া হবে।

এটা বোধগম্য যে, তৃতীয় ধাপে যেতে হলে ফিলিস্তিনিদেরকে ওই মুরুব্বীদের আরও বহু প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। তা-ও ২০০৪-২০০৫ এর আগে নয়। একমাত্র তখনই ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন এবং জেরুজালেমের ওপর অধিকারের মত মৌলিক ইস্যুগুলো আলোচনায় উঠবে।

অসলো চুক্তি

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বুশ প্রশাসন রোডম্যাপ-এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদেরকে যা দিচ্ছে, অসলো চুক্তির চেয়েও তা জঘন্য। তথাকথিত অসলো শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল '৯০ দশকের গোড়ার দিকে। সাত বছর ধরে আলোচনা চলেছিল। প্রথমে ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলি নেতাদের মধ্যে মাদ্রিদে উন্মুক্ত আলোচনা হয়েছিল। পরে নরওয়ের রাজধানী অসলোতে গোপন আলোচনা শেষে সমঝোতা তৈরি হয়েছিল। এই শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল সিনিয়র বুশ, বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাবা। তখন পটভূমিকায় ছিল১৯৯১ সালে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ইরাকিদের বিপর্যস্ত অবস্থা, ফিলিস্তিনিদের প্রথম ইন্তিফাদা। আমেরিকা ও ইসরাইলের সীমাহীন নির্যাতন এবং মার্কিন বশংবদ আরব নেতাদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও এই ইন্তিফাদা তিন বছর চলেছিল। কোনভাবেই তা থামাতে না পেরেই বুশ সিনিয়র ওই অসলো প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তা গড়িয়েছিল ক্লিনটন প্রশাসনের প্রায় শেষ পর্যন্ত। এরও লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামকে খাঁচায় আবদ্ধ করা। সেজন্য তখন এমন এক ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয়েছিল যা বাস্তবে বান্টুস্তানের মত। বান্টুস্তান হল আফ্রিকার এক ধরনের রাষ্ট্র, যার কাগজে-কলমে স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবে কোন সার্বভৌমত্ব নেই। বহুখণ্ডে বিভক্ত এ রাষ্ট্র শাসিতও হয় কোন একক শক্তি দ্বারা নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীপতির দ্বারা। প্রস্তাবিত ওই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রও ছিল বহু খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলো ছাড়া ছাড়া। বিভিন্ন মহাসড়ক ছাড়া এদের মধ্যে আর কোন সংযোগ নেই। ওই মহাসড়কগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো ইসরাইলিদের দ্বারা। কারণ প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরেই বহু ইসরাইলি বসতি থাকার কথা ছিল। এসব ছাড়াও ফিলিস্তিনের আকাশ এবং জলভাগও কার্যত ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে থাকতো।

খুব স্বাভাবিক কারণেই ফিলিস্তিনি জনগণ ওই ধরনের রাষ্ট্র মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে ইয়াসির আরাফতের পক্ষেও তাতে সম্মতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে ইসরাইলিরা ওই শান্তি প্রক্রিয়ার কিছু শর্ত মানতে গড়িমসি করে। এক পর্যায়ে তাঁরাই এটা ভেঙে দেয়। কারণ তাদের আব্দার হল তারা কোন শর্ত মানতে পারবে না, বরং ফিলিস্তিনি নেতৃবৃন্দকেই তাদের দেওয়া শর্তাবলী বিনাবাক্যে মেনে নিতে হবে। মার্কিন-প্রশাসনকেও তারা এভাবেই এগোতে বলেছিল।

যা হোক, শান্তি প্রক্রিয়ার নামে এতসব প্রতারণা ফিলিস্তিনিদের বুকে ক্ষোভের পাহাড় গড়ে তোলে। তারা আবারও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জন্ম নেয় দ্বিতীয় ইন্তিফাদা।

এ ইন্তিফাদা শুরু হয় ২০০০ সালের শরৎকালে। এতে ইতিমধ্যে প্রায় ২৫০০ ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন। মারা গেছে ৮০০ ইসরাইলি। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, গ্রেফতার হয়েছেন। ইসরাইলিরা গ্রামের পর গ্রাম, শহরের বহু উদ্বাস্তু বসতি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। গাজা এবং (জর্ডন নদীর) পশ্চিম তীরের বহু এলাকা ইসরাইল জবর দখল করে নিয়েছে। ফিলিস্তিনের অর্থনীতি একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বেকারত্ব ৮০% এ উঠেছে। তারপরও ফিলিস্তিনিরা অদম্য। তারা তাদের লড়াই অব্যাহত রেখেছেন।

ফিলিস্তিনে কোন শান্তি প্রক্রিয়াকে সফল করার ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে জিওনবাদীরা ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ফিলিস্তিনিকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আরিয়েল শ্যারনের ভারত সফরের বিরুদ্ধে ৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের নাগপুরে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

স্ব-নিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির আন্দোলনের জয়

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার এস ডি ও এবং সার্টিফিকেট অফিসার শিক্ষিত লোনী বেকারদের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। চরমপত্র, ক্রোকের নোটিশ দিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি। ঋণ আদায়ের নামে তারা প্রয়োগ করছেন ব্রিটিশ আমলের কালাআইন পি ডি আর অ্যাক্ট। ঠিক সময়ে ব্যাঙ্কের কিস্তি জমা দিতে পারেনি শুধুমাত্র এই অপরাধে শিক্ষিত ঋণগ্রস্ত বেকার যুবকদের উপর চলছে চরম অত্যাচার। এ জেলা এবং রাজ্যের কোথাও যা ঘটেনি তাই ঘটানো হয়েছে সূতি ব্লকে। আইনি ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত হয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের মিলিত চক্র লোনী বেকারদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করানো হচ্ছে একের পর এক লোনী যুবকদের। আসামীদের মতো কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গিয়ে জেল হাজতে বিনাবিচারে দিনের পর দিন আটকে রাখা হচ্ছে। জেলের মধ্যে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। লোনী যুবকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে জেলার অন্য কোথাও যখন গ্রেপ্তার হচ্ছে না তখন শুধুমাত্র জঙ্গীপুর মহকুমার সূতি ব্লকে হচ্ছে কেন? পি ডি আর অ্যাক্ট তো তাদের উপরই প্রয়োগ হওয়া উচিত যারা কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধ করেনি। অথচ সামান্য চার বা পাঁচ হাজার টাকা অনাদায়ের জন্য জঙ্গীপুর এস ডি ও এবং সার্টিফিকেট অফিসার লোনী যুবকদের উপর এমন অমানবিক আচরণ করছেন। তাহলে কি তাদের অন্য কোন স্বার্থ কাজ করছে?

জঙ্গীপুর জেল হাজতে ২৮ জুন ০২ থেকে ১৯ জুলাই আটক রাখা হয় সূতির ইলিয়াস শেখ, ইব্রাহিম সেখ ও ফাইসুদ্দিন সেখকে। এরপর ২৫ জুলাই ০২ নৈমুদ্দিন মহলদার ও সুকুমার সিংহকে গ্রেপ্তার করা হয়। লোনী বেকার যুবকদের সংগঠন সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ব্যাপক আন্দোলনের ফলে প্রশাসন বাধ্য হয় এদের নিঃশর্ত মুক্তি দিতে, বিষয়টি স্বনিযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহম্মদ সেলিম ও জেলার মন্ত্রী আনিসুর রহমানের নজরে আনা হলে তারা গ্রেপ্তারের ঘটনায় বিস্মিত হন এবং বলেন, গ্রেপ্তার হওয়ার তো কথা নয়। মন্ত্রীরা বিস্ময় প্রকাশ করলেও জঙ্গীপুর এস ডি ও এবং সার্টিফিকেট অফিসার আবারও ১২ জুলাই ০৩ গ্রেপ্তার করেন সুতীর অরুণ কুমার সিংহকে। মন্ত্রীদের নির্দেশ না থাকলে কি কোন আমলা গ্রেপ্তার করতে পারে ? ১ সেপ্টেম্বর শতাধিক যুবক অরুণের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এস ডি ও এবং সার্টিফিকেট অফিসারকে বিক্ষোভ ডেপুটেশান দেয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নন্দদুলাল দাসের সঙ্গে এস ডি ও'র আলোচনা শেষে ২ সেপ্টেম্বর অরুণকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় রোগী ও আত্মীয়ার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায়

এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

গত ১ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া গোবিন্দনগর হাসপাতালে পুতিবালা সিং সর্দার (৩০) নামে একজন রোগী ভর্তি হন। তাকে দেখাশোনার জন্য তার বৌদি সুমিতাসিং সর্দার (৩৫) ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে এদের দুজনেরই মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতাল স্টাফের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ ও চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ ওঠে। জনসাধারণের এই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পালের নেতৃত্বে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে বাঁকুড়া জেলাশাসক ও পশ্চিমবঙ্গ হেল্‌থ ডাইরেক্টরেট-এর নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

৩ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই টাউন লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ৫ সেপ্টেম্বর পুনরায় হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করা হয় (১) রোগী পুতিবালার মৃত্যু এবং সুমিতাদেবীকে খুনের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। (২) তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। (৩) যে পুলিশ অফিসারের নির্দেশে বিনা প্ররোচনায় লাঠিচার্জ হয়েছে তাকে শাস্তি দিতে হবে। প্রতিনিধি দলে নেতৃত্ব দেন কমরেড লক্ষ্মী সরকার, শম্ভুপদ চক্রবর্তী, দিলীপ কুণ্ডু প্রমুখ। আন্দোলনের চাপে অধ্যক্ষ একটি তদন্ত কমিটি করেছেন।

ফিলিস্তিন-ইসরাইল রোডম্যাপ

আরেকটি প্রতারণার দলিল

পাঁচের পাতার পর

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধেও ইসরাইল পশ্চিম তীর, গাজা, গোলান মালভূমি ও সিনাই উপত্যকা থেকে কয়েক লক্ষ ফিলিস্তিনিকে উচ্ছেদ করেছিল। আজকে ওই উদ্বাস্তুদের সংখ্যাটা তাদের সন্তান-সন্ততিসহ প্রায় ৪৫ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা মানবেতর জীবনযাপন করছে লেবানন, জর্দানের শরণার্থী শিবিরে, পৃথিবীর নানা প্রান্তে। তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোন অধিকার নেই। অথচ ইসরাইলি আইন অনুসারে পৃথিবীর যেকোন দেশের ইহুদি ধর্মাবলম্বী যে কোন মানুষ ইসরাইলে গিয়ে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে। কি ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র!

মার্কিন মদতে ইজরায়েল রাষ্ট্রসংঘের তোয়াক্কা করে না

১৯৪৯ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটা প্রস্তাব পাশ করেছিল। তার নম্বর ১৯১। সে প্রস্তাবে ফিলিস্তিনিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার মেনে নিতে ইসরাইলকে বলা হয়েছিল। কিন্তু ইসরাইল তা আজ পর্যন্ত গ্রাহ্য করে নি। এমনকি বর্তমান রোডম্যাপ-এও বুশ প্রশাসন অন্য বহু প্রস্তাবের উল্লেখ করলেও এটাকে চেপে গিয়েছে। শ্যারন এবং ইসরাইলের গোটা প্রশাসন বলছে এটা তারা কখনও মেনে নেবে না। কারণ তা মানলে একক ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে। বুশ প্রশাসন কুর্দ আর শিয়াদের বিরুদ্ধে সাদ্দাম সরকারের নির্যাতনের কাহিনী প্রচার করে কুম্ভীরাশ্রু ঝরায়। কিন্তু ইসরাইলের এই চরম বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে টুঁ শব্দটিও করে না। ওরা সাদ্দামের স্বৈরাচারী আচরণ নিয়ে নানা কাহিনী ফাঁদে আর যে শ্যারন লেবাননের শাতিলা-সাবরা উদ্বাস্তু শিবিরে তিন লাখ ফিলিস্তিনির খুনের দায়ে ইতিমধ্যে বেলজিয়ামের আদালতে দণ্ডিত হতে চলেছে, যার গোটা জীবনটাই ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে ইসরাইলকে সম্প্রসারণের কাজে ব্যয়িত, তাকে নিয়ে শান্তি প্রক্রিয়া চালায়।

শুধু তা-ই নয়, বুশ প্রশাসনের কাছে শ্যারনের মত জঘন্য খুনি শান্তির পক্ষের লোক হলেও ইয়াসির আরাফাত নয়!! অথচ, এখনও পর্যন্ত আরাফাতই ফিলিস্তিনিদের নির্বাচিত নেতা। তাঁর অপরাধ তিনি অসলো চুক্তিতে কথিত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র মানতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এ সমস্যা এড়াতেই মার্কিনীরা রোডম্যাপ প্রকাশের শর্ত হিসেবে আরাফাতকে দিয়ে জোর করে প্রধানমন্ত্রীর পদ খুলে তাতে মহম্মদ আববাসকে বসিয়েছে, যা কোন মতেই গণতন্ত্রসম্মত নয়। বলা হয়ে থাকে তিনি নরমপন্থী। বুশ প্রশাসনের প্রত্যাশা তাকে দিয়ে অনেক কিছু অনুমোদন করিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব হবে?

আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনি বহু গ্রুপ বা রাজনৈতিক শক্তি অসলো চুক্তির বিরোধিতা করেছে। রোডম্যাপকেও তারা চূড়ান্ত প্রতারণার এক দলিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যদিও সম্প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তারা কিছু শর্তসাপেক্ষে তিন মাস অস্ত্র বিরতিতে রাজি হয়েছে। তবে আমরা জানি ফিলিস্তিনিরা যত নমনীয়তাই প্রদর্শন করুক না কেন, যে ইসরাইল চায় গোটা ফিলিস্তিনকে গ্রাস করতে সে-ই সব কিছু ভণ্ডুল করে দিবে। ইসরাইল নিজে একটা গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া রাষ্ট্র। তার চরিত্র ভয়ঙ্করভাবে বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং এর শাসকদের একটাই কাজ তা হল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থবিরোধী যে কারও টুঁটি চেপে ধরা। ফলে তার পক্ষে কখনোই মধ্যপ্রাচ্যের বুকে একটা স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

আমেরিকা সফল হবেনা

আর এ রোডম্যাপ-এর পেছনে বুশ প্রশাসনের উদ্দেশ্যও পরিষ্কার। আগেই বলা হয়েছে মার্কিনীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চেষ্টা চালাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তেল-গ্যাস ভাণ্ডারের ওপর নিজেদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। রোডম্যাপ-এর একমাত্র লক্ষ্যও হল ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধের শক্তিকে পুরোপুরি নির্মূল করা। গত ৯ মে জর্জ বুশ কর্তৃক একটা মার্কিন-মধ্যপ্রাচ্য 'মুক্ত বাণিজ্য এলাকা' তৈরির ঘোষণার পর এটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। তথাকথিত এই মুক্ত বাণিজ্যের নামে পৃথিবীর অর্থনৈতিক দানব মধ্যপ্রাচ্যের বামন অর্থনীতিকে গিলে খাবে এটা বলাই বাহুল্য।

এখন প্রশ্ন হল, মার্কিনীরা কি তাদের এই অভিসন্ধি পূরণে সক্ষম হবে? ফিলিস্তিনিরা বর্তমান চাপের মুখে মার্কিন-ইসরাইল আধিপত্যকে মেনে নেবে? ফিলিস্তিনিদের গত ৫০ বছরের ইতিহাস বলে তা কখনোই সম্ভব নয়। বর্তমান মুহূর্তে ইঙ্গ-মার্কিন দখলদারদের হাতে ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ইরাকের সাদ্দাম সরকারের পতন, হয়তো তাদের সে সংগ্রামকে একটু দুর্বল করে দেবে। তবে অচিরেই তা আরও শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। বর্তমান ইরাক তার প্রমাণ। আর ইতিহাসও বলে, অত্যাচারীর দশদিন, তবে অত্যাচারিতের জন্যও একটা দিন আসে।

দুলালবাহিনীর জন্মের বীজ রয়েছে সি পি এম রাজনীতির মধ্যেই

অনেক টানাপোড়েনের পর শাসকদল সি পি আই (এম), তাদের প্রভাবশালী নেতা দমদমের দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করেছে। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, তাকে বহিষ্কার না করে নেতৃত্ব মুখ রক্ষা করতে পারছিলনা। মাত্র কয়েকদিন আগে আদালত তাকে জোড়াখুনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। এই দুলালবাহিনী গত বছর দমদমের আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের পেছনের মাঠে চন্দন চক্রবর্তী এবং সঞ্জীব গোস্বামী নামে দুই ব্যক্তিকে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে খুন-সন্ত্রাস-তোলা আদায় — এসবের মূল নায়ক দুলালবাহিনী। নানা অছিলায় নানা জনকে এরা 'টার্গেট' করত এবং ইচ্ছামত জরিমানা ধার্য করত এবং জুলুম করে জরিমানার টাকা আদায় করত। লক্ষ লক্ষ টাকা তুলত এভাবে। এই লুটের বখরা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্বও ছিল, আবার লুটের প্রশ্নে ঐক্যও ছিল। এলাকায় কোন দোকান করতে হলে, বাড়ি বানাতে হলে, বা ফুটপাতে বসে লঙ্কা বেচতে হলেও দুলালবাহিনীর মনোতুষ্টি এবং সেলামী না দিয়ে উপায় ছিল না। এরা ছিল এলাকার ত্রাস — ক্ষমতাসীন পার্টির মদতে এবং পুলিশী নিষ্ক্রিয়তায়। ফলে থানায় এদের নামে কেউ অভিযোগ জানাবার সাহস দেখাতনা, থানাও কোন অভিযোগ নিতনা। থানা পুলিশ সবই ছিল এদের হাতের মুঠোয়। ফলে অবাধে চলেছে এলাকা জুড়ে এদের দৌরাত্ম।

এহেন দুলাল ব্যানার্জী, যাকে আজ সি পি এম অনেকটা নিরুপায় হয়ে বহিষ্কার করল, দলীয় পরিমণ্ডলে তার এই বাড়বাড়ন্ত সম্ভব হল কীভাবে? একথা এখন সকলেরই জানা, দলের রাজ্য কমিটির আরেক প্রভাবশালী নেতা রাজদেও গোয়ালা সহ আরো অনেকেই এক্ষেত্রে দুলাল ব্যানার্জীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দুলাল ব্যানার্জীকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, এই রাজদেও গোয়ালাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেন, পথ অবরোধ করেন এবং দমদম স্টেশন সংলগ্ন পেয়ারাবাগান মাঠে দুলাল ব্যানার্জীর মুক্তির দাবিতে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে ভাষণও দেন। খুনের অপরাধে যখন এলাকা জুড়ে নিন্দা, ধিক্কার, শাস্তির দাবি উঠছে, সেই সময় দুলালবাহিনীর পক্ষেই এই নেতা দাঁড়িয়ে তার গুরুতর অপরাধকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেন। দলের নেতৃত্বের অনুমোদন ছাড়া কখনই এ কাজ সম্ভব হতে পারে না। তার পুরস্কার হিসাবেই কি রাজ্য নেতৃত্ব তাকে 'ক্লিনচিট' সার্টিফিকেট দিয়ে ট্রাম কোম্পানীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন? শুধু কি ইনিই পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন? দলগতভাবে সি পি এম সহজে তাকে বহিষ্কার করতে চায়নি। অনেক গড়িমসি করেছিল। আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাছাড়া দুলাল ব্যানার্জীর সঙ্গে অভিযুক্ত অপর তিন পলাতক আসামীর সদস্যপদ নবীকরণের মধ্য দিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিলেন, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই দুলাল ব্যানার্জীকে তাদের বহিষ্কার করতে হয়েছে। অন্তরালের সংবাদ যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দলেরই অপর এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী — যারা ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে কোন্দল থেকে দুলালবিরোধী বলে পরিচিত, তাদের চাপেই নেতৃত্বকে এ কাজটি করতে হয়েছে। এখন রাজদেও গোয়ালাকে ট্রাম কোম্পানীর 'চেয়ারম্যান' পদ দিয়ে ও ঐ তিনজনের সদস্যপদ বহাল রেখে নেতৃত্ব দুলাল গোষ্ঠীকেও সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছেন। ফলে এই বহিষ্কারের ঘটনার মধ্যে নীতি-আদর্শের কোন ভূমিকা নেই।

অনেকেরই হয়তো স্মরণ আছে, জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ই যখন সি পি এম দলের দুর্নীতি, দলবাজি, দুর্বৃত্তদের নিয়ে রাজনীতি, পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে জনগণের মধ্য থেকে প্রবল প্রশ্ন উঠছিল, সি পি এম সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ জমা হচ্ছিল, তখন বহু বছর ধরে সংবাদমাধ্যমের মালিকরা জ্যোতি বসুকে — আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তাঁর সম্পর্কে একটা 'পরিচ্ছন্ন', 'দক্ষ' ভাবমূর্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা করে গিয়েছে — যার মোদ্দা কথা ছিল, 'জ্যোতি বসু ভাল, সি পি এম খারাপ'। সরকার ও প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখার জন্য, বিশেষত যতদিন না পছন্দমত বিকল্প ব্যক্তি বা দল পাওয়া যাচ্ছে ততদিন বুর্জোয়াদের এটা দরকার। এখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পর্কেও একই প্রচার করা হচ্ছে।

অথচ, মূল প্রশ্নটা এখানে ব্যক্তিগত দুর্নীতির নয় — রাজনৈতিক দুর্নীতির, রাজনৈতিক সততা ও অসততার। অতীতে এই পশ্চিমবঙ্গেও এমন কংগ্রেসী মন্ত্রী ও নেতা ছিলেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক দুর্নীতি ও অসততা ছিল সীমাহীন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যদি রাজনৈতিকভাবে সৎ হতেন তাহলে দুলাল ব্যানার্জীদের এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারত না, রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য দুলাল ব্যানার্জীর সৃষ্টি হতে পারতনা, পুলিশ-প্রশাসন এদের সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকত না, এবং তারপরও মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যকে 'আইন-শৃঙ্খলার মরূদ্যান' বলে গর্ব করতে পারতেন না।

ফলে দুলাল বাহিনীর সমাজবিরোধী হিসাবে উত্থান দল-বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। তাই এর উৎস খুঁজতে হবে দলের রাজনীতির মধ্যেই। কারণ এতো শুধু একক দুলাল ব্যানার্জী নয়, ২৬ বছরে পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় এইরকম খ্যাত-অখ্যাত বহু দুলালবাহিনীর চাষ হচ্ছে, লালনপালন হচ্ছে, যারা সি পি এমের হয়ে 'ভোট কালেকশন' করে, টাকা জোগায়। এবং ভোটে জেতার জন্য যা যা করণীয় সবই করে। বুথ দখল করা, ছাপ্পা ভোট মারা, বিরোধীদের মেরে শায়েস্তা করা — প্রয়োজনে সবই করে এরা। আজ এদের বাদ দিয়ে সি পি এমের রাজনীতি অচল।

কেন সি পি এম আজ ভোটে জেতার জন্য, অর্থের জন্য পুরোপুরি জনগণের উপর নির্ভর করতে পারছেনা? কারণটি সহজেই বোধগম্য। এদের ২৬ বছরের শাসনে সাধারণ মানুষ আজ অতিষ্ঠ। দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, ভাড়াবৃদ্ধি, ট্যাক্সবৃদ্ধি, বেকারিত্ব, ছাঁটাই, কলেকারখানায় মালিকীজুলুম, অনাহারী শ্রমিকের মৃত্যু, ফসলের দাম না পেয়ে চাষীর আত্মহত্যা, সবই অন্যান্য বুর্জোয়া দল শাসিত রাজ্যগুলির মতই এরাজ্যেও ক্রমাগত বাড়ছে। সাধারণ মানুষ তাদের শাসনে বামপন্থার লেশমাত্র খুঁজে পাচ্ছে না। কংগ্রেস, বিজেপি ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলের সরকারগুলির মতই সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারও পুলিশ দিয়ে গণআন্দোলন দমন করছে। শুধু তাই নয়, কয়েক ডিগ্রি বেশি এগিয়ে গিয়ে বামপন্থার ঐতিহ্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে দলীয় ক্রিমিনাল নামিয়ে গণআন্দোলন ভাঙছে। এদের বিরুদ্ধে জন অসন্তোষ তাই ধূমায়মান।

শুধু তাই নয়, সি পি এম দলে কণ্ট্রাক্টর, প্রোমোটার, জোতদারদের অবাধ আনাগোনা এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকাল ও জোনাল কমিটিতে ওরাই নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। এসব দেখে দলের গরিব খেটেখাওয়া মানুষেরা ক্ষোভে হয় বসে যাচ্ছেন, নতুবা অন্য দলের দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন। কারণ প্রতিমুহূর্তেই এরা গরিব মানুষদের ঠকায়। বঞ্চ না-গঞ্জনা-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী সি পি এম দলের এক আভ্যন্তরীণ নোটেই নাকি বলা হয়েছে — "পার্টিটা হয়ে গেছে আজ সুযোগ-সন্ধানী লোক, ঠিকাদার, প্রোমোটার এবং সেই সমস্ত লোকেদের সমাহার, যারা তুচ্ছ ব্যক্তিস্বার্থে শ্রমিকদের স্বার্থ বিক্রি করতে দ্বিধা করেনা।" (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ১-৯-০৩) [" The party has become a conglomerate of self seekers, promoters, contractors, middleman, and the people who sell workers interest for their narrow gain."]

নেতাদের এই স্বীকারোক্তিই বুঝিয়ে দেয়, দলের অবস্থা কতটা শোচনীয়!

সহজ সত্য কথা হল, কায়েমী স্বার্থবাজ ও শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর লুটের স্বার্থ দেখব, আবার জনস্বার্থেরও সেবা করব — এ দুটো একসঙ্গে করা যায় না। একটা অপরটার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। সরকারি ক্ষমতায় থাকার জন্য সি পি এম নেতৃত্ব পুঁজিপতিশ্রেণী ও কায়েমীস্বার্থবাজদের সেবার রাস্তা নিয়েছে, অতএব জনস্বার্থ দু'পায়ে মাড়িয়ে চলছে। পরিণামে সাধারণ মানুষের ভালবাসা-শ্রদ্ধা-সমর্থন এরা যত হারাচ্ছে, ততই পুঁজিপতিশ্রেণীর উপর এদের নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বাড়ছে। এদের নেতা কর্মীদের উপর পড়ছে পুঁজিবাদের সমস্ত আবিলতা। দেখা দিচ্ছে নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিস্বার্থে যা ইচ্ছে তাই করার বেপরোয়া মানসিকতা। স্বার্থপরতা, দুর্নীতিগ্রস্ততা, ভ্রষ্টাচার, উগ্রতা, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এগুলি পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলগুলির নেতা-কর্মীদের মধ্যে দেখা দিতে বাধ্য। ক্ষমতাসীন হলে সেই সমস্যাগুলি উৎকটরূপে দৃশ্যমান হয় — এই যা পার্থক্য। কোনও একটা বামপন্থী দল সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষের স্বার্থে সর্বস্ব দিয়ে শোষণমুক্তির আন্দোলন করছে, নাকি পুঁজিপতিদের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কোনক্রমে সরকারি ক্ষমতায় টিকে থাকাকেই মূল লক্ষ্য করে ফেলেছে, তার উপর নির্ভর করছে সংশ্লিষ্ট দলটির নেতা-কর্মীরা উন্নত চারিত্রিক মান অর্জন করবে নাকি নৈতিকভাবে চূড়ান্ত অধঃপতিত হবে।

পরাধীন ভারতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার লড়াই উন্নত চরিত্র সৃষ্টি করত। নেতাজী সুভাষ বোস, ক্ষুদিরাম, সি আর দাশ, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, আসফাকউল্লা এই সমস্ত চরিত্র জন্ম নিয়েছিল ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এমনকি গান্ধীবাদীরা — যারা আন্দোলনের প্রশ্নে আপোষকামী ও দোদুল্যমান ছিল, যেহেতু জাতীয়তাবাদের আদর্শে স্বাধীনতার আন্দোলনটা তখন প্রগতিশীল ছিল, সেহেতু তাঁদেরও একটা চারিত্রিক উৎকর্ষতা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর এই জাতীয়তাবাদী আদর্শটাই প্রগতিবিরোধী ও সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়ে পড়ে — যার প্রতিফলন কংগ্রেস শাসনের মধ্যে ও তাদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিপুলভাবে পরিস্ফুট হয়। এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ও দেশে দেশে সফল মুক্তিসংগ্রামের প্রবল প্রভাবে দেশের মধ্যে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে কংগ্রেসী অপশাসনের বিরুদ্ধে যুক্ত বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয় — সমাজে যার প্রভাবে সেদিনকার সি পি আই-সি পি আই এম-এর নেতা-কর্মীদের মধ্যেও চরিত্রের একটা নৈতিক মান দেখা গিয়েছিল। কিন্তু গণআন্দোলনগুলিকে নগ্ন পার্লামেন্টারি রাজনীতির খাতে পরিচালিত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে তাদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে এই নিয়েই সি পি আই-সি পি এম নেতৃত্বের সাথে বারবার এস ইউ সি আই-এর আদর্শগত বিরোধ ঘটেছে। এস ইউ সি আই চেয়েছে যাতে বামপন্থী গণআন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে পরিচালিত করা যায়। এজন্যই এস ইউ সি আই সর্বদা আন্দোলনের কর্মীদের ব্যক্তিগত জীবনে ও রাজনৈতিক আচারআচরণে উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতি চর্চার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। সেখানে সি পি এম নেতৃত্ব আন্দোলন-লড়াইয়ের নামে যেভাবেই হোক ভোটের জমি তৈরি করার দিকে লক্ষ্য রেখেছে, মার্কসবাদ তাদের কাছে নিছক শ্লোগানের বেশি কিছু হয়ে দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে যতই সি পি এম নেতৃত্ব আন্দোলনের পথ ছেড়ে, ধীরে ধীরে সৎ কর্মীদের অগোচরে অথবা তাদের অসচেতনতার সুযোগ নিয়ে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী দলগুলোর সাথে সমঝোতা ও আঁতাতের ভিত্তিতে সরকারি গদি দখলকেই দলের মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রমে পরিণত করেছে দলে ততই অনৈতিকতা ও ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি পেয়েছে — যেটা তারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে নগ্ন ও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যেজন্য কেবল পশ্চিমবঙ্গই নয়, কেরালাতেও সি পি এম নেতা কর্মীরা আজ দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের পাঁকে ডুবেছে।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সি পি এম ক্ষমতায় থাকাকেই মূল লক্ষ্য করে ফেলে এবং ক্ষমতায় না থাকলে বামপন্থা থাকবেনা, এইরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করে। বামপন্থা আর সরকারি ক্ষমতাকে তারা এক করে ফেলে এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা আন্দোলনের রাস্তা শুধু বর্জনই করে তাই নয়, আন্দোলন দমনের শক্তিতে পরিণত হয় এবং এইভাবে তারা বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে। আজ সি পি এম যেভাবে ক্ষমতাসীন হচ্ছে এবং টিকে আছে তা দেখে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষ ব্যথা পান, দুঃখ পান, গভীর ব্যথায় তারা খুঁজে বেড়ান, এর সমাধান কোথায়?

আমরা জানি, আজকের দিনে পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে উন্নত নৈতিকতার আধারে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া বামপন্থী নৈতিকতা রক্ষা করা যায় না, উন্নত চরিত্রও গড়ে উঠতে পারেনা। শুধু তাই নয়, বামপন্থা বিসর্জন দিলে সেই দল অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতই সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর শক্তিতে

আটের পাতায় দেখুন

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৬ বর্ষ / ৭ সংখ্যা

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কানকুন সম্মেলনস্থলে পুলিশের লড়াই

মুক্ত বাণিজ্যের প্রহসনের প্রতিবাদে সালভাডোরে শিশু কোলে মায়েদের মিছিল

দু'লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

উৎপাদনের দিক থেকে পর পর তিন বার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির টাকা — এই নিয়ে দুবার বাজেয়াপ্ত করল পশ্চিমবঙ্গ দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। গত ২২ আগস্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দূষণের কারণে ও ছাইজল প্লাবিত গ্রামগুলিতে প্রয়োজনীয় ত্রাণ না দেওয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দু লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমা থাকা ১০ লক্ষ টাকা থেকে এই টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে বলে এক নির্দেশে পর্ষদ জানিয়েছে। এবং অবিলম্বে ২ লক্ষ টাকা পর্ষদে জমা দিতে বলেছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে। এরপরও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আর কোন যোগাযোগ না করেই আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পর্ষদ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে। গত ২০০১ সালে ঐ একই ভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দূষণের কারণে কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ১ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। এ বিষয়ে গত ১ সেপ্টেম্বর সল্টলেকের পরিবেশ ভবনে এক শুনানি হয়। কে টি পি এস'র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শুভাশীষ রায় (সিনিয়র ম্যানেজার, পারসোনাল), গোপাল চন্দ্র মুখার্জী (সিনিয়র ম্যানেজার সিভিল), অজিত ঘোষ (ম্যানেজার, পরিবেশ)। পর্ষদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেবীপ্রসাদ ব্যানার্জী (ল-অফিসার), সমীর দত্ত (জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার)। অভিযোগ-কারীদের পক্ষে ছিলেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে শঙ্কর মালাকার, জগন্নাথ মণ্ডল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ নম্বর ছাই পুকুরের বাঁধ ভেঙে মেছেদা, আন্দুলিয়া, রাকসাচক গ্রাম তিনটির প্রায় ১৫০০ মানুষ বন্যাপ্লাবিত হয়ে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারপর একমাস অতিক্রান্ত হলেও ঐ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা প্রয়োজনীয় ত্রাণ পাননি। প্রথম দিন চিড়া, গুড়, তারও দুদিন পরে একদিন সামান্য চাল, ডাল, আলু দেওয়া হয়েছিল। মেডিক্যাল টিম এলাকায় এলেও প্রয়োজনীয় ঔষধ ছিল না। রাস্তা এখনো সংস্কার করা হয়নি। পুকুরগুলির জল এখনো শোধন করা হয়নি। পরিবার পিছু মাত্র ১ কেজি করে চুন দেওয়া হয়েছে ও সামান্য ব্লিচিং। যাদের ঘর পড়ে গিয়েছে তাঁরা এখানো বাড়ির বাইরে বসবাস করছেন। সর্বোপরি যে জায়গায় বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল সেখানে এখনো বাঁধ বাঁধা হয়নি। ঐ ঘটনার পর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তারা গ্রামগুলি পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলে এই ব্যবস্থা নেন।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দূষণ প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র ডাঃ সন্তোষ মাইতি বলেন অবিলম্বে কে টি পি এস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে র রায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনেরই ফসল

বিদ্যুৎ পর্ষদের বর্ধিত মাশুল বাতিলের রায়কে স্বাগত জানিয়ে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন ঃ

"বিদ্যুৎ পর্ষদের অভিন্ন হারে ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা বর্ধিত মাশুল আদায়ের যে অনুমোদন বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দিয়েছিল, গতকাল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তা বাতিল করে যে রায় দিয়েছে আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আমরা মনে করি, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা যে আন্দোলন করে চলেছেন এই রায় তারই ফসল।

সি-ই-এস-সি গত মে মাস থেকে একইভাবে ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা হারে বর্ধিত মাশুল আদায় করে চলেছে। আমরা আশা করি, ডিভিশন বেঞ্চে র বর্তমান রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সি-ই-এস-সি সেই বর্ধিত মাশুল নেওয়া বন্ধ করবে।

আমরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অবিলম্বে ডিভিশন বেঞ্চে র রায় কার্যকরী করে গ্রাহকদের টাকা ফেরৎ দেবার জন্য দাবি জানাচ্ছি।"

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার হাত মিলিয়েই নতুন বিদ্যুৎ আইন তৈরি করেছে

একের পাতার পর

করেছে। এ থেকে পরিষ্কার যে রাজ্য সরকারের এই বেসরকারীকরণের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এই আইনের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে দেখান যে, 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩' কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মিলিত উদ্যোগেই রচিত হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুতকে পণ্যে পরিণত করে লগ্নীকারীদের লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। প্রায় ৬০ শতাংশ মাশুলবৃদ্ধির ব্যবস্থা হচ্ছে। এর বোঝা ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া মানুষের ওপর চাপবে। ক্যাপটিভ উৎপাদনের অনুমোদন দিয়ে বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। অভিন্ন মাশুলের কথা বলে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে সেই টাকায় বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পকে সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যুৎ চুরি করলে বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে জেলে না পাঠিয়ে টাকা দিয়ে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন কার্যকরী হলে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাই হবে। বেকার সমস্যা বাড়বে। সি ই এস সি'র ৪৫০০ জন শ্রমিকের ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা, আর পর্ষদের ভি আর এসের পরিকল্পনা এই আইনের ফলে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকদের বিচার চাইবার মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই আইনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তাই তারা কোন বিকল্প প্রস্তাব দেয়নি। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে আজ তারা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে গদির লোভে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের স্বার্থে এই আইন তৈরি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী এই আইনকে পাল্টানোর জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সি পি এম-এর রাজনীতি

সাতের পাতার পর

পরিণত হয়। তার কুফল ভোগ করতে হয় গোটা সমাজকে। তাই সমাজের যারা সাধারণ নাগরিক তাদেরকেও ভাবতে হবে, কীভাবে সামাজিক সুস্থতা, নিরাপত্তা পেতে পারি, দুলালবাহিনীর হাত থেকে সমাজকে কী করে রক্ষা করতে পারি। আর এটা করতে হলে যে রাজনীতি দুলালবাহিনীর জন্ম দিচ্ছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে ও রক্ষা করছে, সেই রাজনীতিকে পরাস্ত করতে হবে, তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে একটা ব্যক্তির অসামাজিক কার্যকলাপ সমাজের যত না ক্ষতি করে, একটা দলের সামগ্রিক অসামাজিক কার্যকলাপ তার থেকে সমাজের বহুগুণ বেশি ক্ষতি করে। সমাজে সুস্থভাবে বসবাস করাই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সামাজিক সুস্থতা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই সমস্ত অনিষ্টকর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। একই সাথে যে লড়াই-আন্দোলন মূল শোষণমুক্তির আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের দাবিতে গড়ে উঠছে তাকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদী যুবশক্তির জাগরণ ঘটাতে হবে। একমাত্র উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উত্তাপেই অবক্ষয়ের কবল থেকে যুবশক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এবং একমাত্র এই পথেই দুলালবাহিনীর মত কলঙ্কজনক কার্যকলাপ ও রাজনীতির হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারে।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net